সিলেবাসের বাইরে

অমিতা দাস

'আম পাতা জাম পাতা তেঁতুল পাতা টক, তোমার সাথে প্রেম করতে আমার ভারি শখ। আসবে নাকি কচুর বনে সন্ধে হলে শুরু, জানবে না কেউ তিন সত্যি বুকটি দুরু দুরু।' এসব কথা লেখা একটা কাগজ পাবার পর পুরো ক্লাসে হুলস্থুল। ম্যাডামরা সবাই ফিসফাস করছেন। মাধ্যমিক ক্লাসের ছাত্রী রিনির অংক খাতায় এই কাগজটি পাওয়া গেছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে ডাকা হলো টিচার্স রুমে। অনেক জেরায় জেরবার হবার পর মেয়েটি কেঁদেকেটে জানাল, সে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে একটি ছেলে, আর প্রায়ই তাকে ডাকে। সে জোর করেই এই কাগজের টুকরোটি গুঁজে দিয়েছে। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে যে ওই ছেলেটি বলেছে সে নাকি ওকে ভালবাসে। আর এই চিঠিটা দিয়ে বলেছে, সন্ধেবেলা একদিন দেখা করলে একটা দামি উপহার দেবে ওকে।

আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলাম আর মজা পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয়, এমন ঘটনা আমাদের সমাজে হরহামেশাই ঘটে। আদর, ভালোবাসা আর ধর্ষণের মধ্যে কোনো তফাত বোঝার আগেই অনেক মেয়েশিশুর নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

আমরা বড়ো হই, শিক্ষিতও হই, কিন্তু জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা হয় না। বিশেষ করে যৌনশিক্ষা বিষয়টি আমাদের সিলেবাসের বাইরেই থেকে যায়। কিশোর-কিশোরীদের কাছে 'যৌন' শব্দটা কান চেপে শোনার মতো একটা আপত্তিকর শব্দ। এই বিষয়টির প্রতি কিশোর-কিশোরীদের বন্ধ দরজার ওপারের কৌতূহল তাই অদম্য হয়ে ওঠে। আর এই অদম্য কৌতূহলবশতই তারা পা বাড়ায় ভুল পথে। যাদের কাছে লজেন্স আর চুমু সমার্থক, তাদের প্রলোভন দেখিয়ে খাদে টেনে নেওয়ার লোকের অভাব নেই।

দরজাটা খুলে দিতে হবে, ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে জীবনের আর পাঁচটি স্বাভাবিক ঘটনার মতোই যৌন আচরণও একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাকে বিকৃত না করলেই হলো। সমস্ত কিছুরই যেমন একটা সময় আছে, এইসব আচরণেরও ঠিক সময় ও পরিবেশ আছে, পাঁচ বছর বয়সে যেমন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া যায় না। বয়ঃসন্ধিতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শরীরেই আস্তে আস্তে শুরু হয় শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর গঠন প্রক্রিয়া। তাদের পরিণত হওয়ার সময় দিতে হয়। জানাতে হবে পরিণত না হতে দিলে ঠিক কী কী বিপদ ঘটতে পারে। জানাতে হবে যথেচ্ছ যৌনাচার কেন করা উচিত নয়। কেন বিশ্বাস করা উচিত নয় অপরিচিত কাউকে। জানাতে হবে যৌনরোগ কী, কীভাবে তা ছড়াতে পারে, আর তার

পরিণতিই বা কী হতে পারে? সর্বোপরি তাদের জানাতে হবে শিশু বয়সে বা কৈশোরে যাকে তারা প্রেম-ভালোবাসা বলে ভুল করে, তা আদপেই প্রেম নয়। আবার প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কেও তাদের খুব স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দিতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে তাদের স্বাভাবিক যৌনজীবনের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি না হয়। চেষ্টা করতে হবে গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজ দিয়ে তাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় করতে, যাতে শরীর অসময়ে বেশি ছটফট করে না ওঠে। আর এই সবের জন্যই যৌনশিক্ষাকে পাঠক্রমের অংশ করা দরকার।

হয়ত-বা কেউ বলবেন, পড়াতে গিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হবে না তো তাদের বয়ঃসন্ধির যৌন চাহিদাকে? বিষয়টি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে অভিজ্ঞতায় বলা যায়, এতদিন যে পড়ানো হয় নি, তাতে কি সমস্যা কিছু কমেছে? বরং হিতে বিপরীতই হয়েছে।

নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। কোনো এক আদিম মানব কী এক আপেল খেয়েছিল বলেই না আজ এত কথা! না, বড়ো হয়ে আমরা এমন বিরাট কিছু কাজ করি নি। ছোটদেরও সব জানার অধিকার আছে।

আজ বলে নয়, যুগে যুগে, কালে কালে বাচ্চাদের মনে উঁকি দেয় একই প্রশ্ন, এলেম আমি কোথা থেকে? যৌনশিক্ষার শুরু তাই রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দরভাবেই না করেছিলেন, 'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। ঠিক, এভাবেও তো বলা যায়। বলছি না পশ্চিমী শিক্ষার ধাঁচে সেক্স এডুকেশন বা যৌনশিক্ষাকে এমন পর্যায়ে আমাদের নিয়ে যেতে হবে যে, মা মেয়েকে তৈরি করে ডেটিং-এ পাঠাবেন, বরং বিজ্ঞান, কল্পনা আর স্নেহ মাখিয়ে আমরা এই কাজটি শুরু করি না কেন রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে, আমাদের মতো করে?

নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খল!

'তোমার এখন খেলতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বলেছি না এই সময় খেলতে নেই'।

'এই কদিন তুমি বাইরে যেও না, অমঙ্গল হবে'।

'কোনো কিছুতে হাত দিও না, নষ্ট হয়ে যাবে!'

এইরকম অসংখ্য 'না' দিয়ে শুরু হয় কিশোরীর জীবন। সেই 'না'গুলোই কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবন, যৌবন ছাড়িয়ে প্রায় বার্ধক্যের মুখে গিয়ে শেষ হয়। মেনোপজে পৌঁছে যেন এই সব 'না' থেকে মুক্তি, তার আগে নয়।

কী নিয়ে কথা বলছি যেন? জনসমক্ষে সেটাও যে বলা বারণ। পিরিয়ড হলে 'শরীর খারাপ' বলতে হয়। প্রয়োজনে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে হয়। না হলে চুপ করে থাকতে হয়। এইসব শিখেই তো বড়ো হয়েছি আমরা। আধুনিক মা প্রতিবাদ করলে, দাদি-নানি বাধা দেবেন। দাদি-নানি বুঝলে পাশের বাড়ির আপত্তি তৈরি হবে। সেটাও সামলাবে অন্য কেউ। আবার অন্য আরেকজন। এভাবেই চলবে। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে চলছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু দেশে পিরিয়ড নিয়ে নিয়মবিধি, নিষেধাজ্ঞার একটা লম্বা তালিকা রয়েছে।

ভারতে সম্প্রতি কিছু তরুণী ‘হ্যাপি টু ব্লিড’ নিয়ে একটা জনমত তৈরি করার চেষ্টা করেছে। মেয়েরা তাদের বহুদিনের জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ করার একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে। কেউ পোস্টার তৈরি করে, কেউ-বা স্যানিটারি প্যাডের ওপর প্রতিবাদের শব্দ এঁকে। কেউ-বা জ্বালাময়ী শব্দে জানাচ্ছে তাদের মনের গভীরের ক্ষতের কথা। মেয়েরা ঋতুস্রাব বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা মা-চাচির কাছেই পায়। এর সাথে জড়িয়ে থাকে বিভিন্ন সংস্কার, শিক্ষা; যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনোই সম্পর্ক নেই।

প্রথমবার পিরিয়ড হওয়ার পর একটি মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই একটু সন্ত্রস্ত থাকে। আমরা কজন আগে থেকে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করি? বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা সচেতন? নাকি ন্যাপকিন ব্যবহারের ট্রেনিংই যথেষ্ট। আজকের যুগে যেখানে টেলিভিশন খুললেই স্যানিটারি ন্যাপকিন-এর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সেখানে ঋতুস্রাব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা দূরে থাক, উল্লেখ করাও নাকি লজ্জার! শপিং মল-এর দৌলতে এখন তাও কিছু মেয়ে নিজেরা স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারেন। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দায়িত্বটি বাড়ির পুরুষদের পালন করতে হয়। বাড়িতে প্যাকেটটি আসে কাগজের মোড়কে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যেন কোনো নিষিদ্ধ জিনিস কেনা হয়েছে। আর গ্রামাঞ্চলের চিত্র? খুবই ভয়াবহ।

বাংলাদেশ তো রয়েছেই, এশিয়ার বহু দেশের বেশির ভাগ মেয়ে মিন্সট্রুয়েশনের সময় এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় পর্যন্ত পায় না। স্যানিটারি প্যাড-এর কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। অন্তত ৭০ শতাংশ মেয়ে স্যানিটারি হাইজিনের অভাবে বিভিন্ন অসুখে ভোগে এবং প্রতিবছর তাদের মধ্যে ১০ শতাংশ মেয়ে মারাও যায়। বহু সংস্থা এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই দরিদ্র দেশে যাদের খাবার কেনার পয়সা নেই, তাদের কাছে স্যানিটারি প্যাড কেনা বিলাসিতা বললেও কম বলা হয়।

এখনো তৃতীয় বিশ্বের বহুসংখ্যক মেয়ে অবজ্ঞা, লজ্জা, ঘৃণা নিয়ে মাসের এই বিশেষ দিনগুলো কাটান। তাদের গরুর গায়ে হাত দেওয়া বারণ। এমনকি গাছের গায়ে হাত দেওয়াও বারণ! তারা আয়নায় মুখ দেখতে পারে না। কোথাও কোথাও খাবারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দেখা গিয়েছে, এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের গ্রামাঞ্চলের অগণিত মেয়ে ঋতুবতী হওয়ার পর স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশেও এমন ঘটনা একেবারে কম নয়।

যাঁরা শহরের আধুনিক পরিবেশে বড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য ঠেকবে। তবু ভেবে দেখুন তো, আমরাও কি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছি? বহু শিক্ষিত নারী আছেন, যাঁরা এখনো নিয়ম ভাঙার সাহস পান নি। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা-বা অভ্যাসে।

দাবি করা হয়, প্রতিটি সংস্কারের একটা বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলা হয়, এই দিনগুলোয় মেয়েদের হয়ত একটু বেশি যত্ন ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সে কারণেই এত নিয়ম। তাই যদি হয়, তাহলে সারাদিন মেয়েরা যে ঘরে-বাইরে এত কাজ করে চলেছে তা নিয়ে তো কেউ আপত্তি তোলেন নি। যদি ধরেই নেই যে এই সময়টা মেয়েদের বিশেষ সময়, তাহলে সে বিশেষ সময়ে বিশেষ যত্ন কজন পান?

হ্যাঁ, শারীরিক যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার থেকেও মনের যন্ত্রণা অনেক বেশি। সমটাকে ঘিরে একটা ভয়, আতঙ্ক চেপে বসে। এ যেন এক অস্বাভাবিক ঘটনা, এই ধারণা মাথায় ঢুকে বসে থাকে।

সেটা তাড়াতে না পারাটা যন্ত্রণার। পিরিয়ড যে আসলে মলমূত্র ত্যাগের মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার, সেটা মানতেই পারলাম না আমরা, মানতে দেওয়া হলোও না। কখনো কি আমরা ভাবতে পারি না যে এই বিশেষ দিনগুলো আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টির সক্ষমতার সম্ভাব্য সূচনার উদযাপন?

আরেকটি কথা, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ওয়াল্ট ডিজনির 'স্টোরি অফ মিন্সট্রুয়েশন' বইটা আমাদের দেশের সবার জন্য পড়া বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্যই এটি রচনা করা হয়েছিল।

আমার মত কেন অন্যের হবে

আগেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজের একটা নিষেধাজ্ঞার তালিকা নিয়ে আমরা বড়ো হই। ছোট থেকে বড়ো হয়ে ওঠার পথে— দেখো না, শুনো না, বোলো না, কোরো না, খেয়ো না, মিশো না, ঠিক না, উচিত না, ইত্যাদি অজস্র 'না'-এর ঘেরাটোপে বন্দি থাকতে থাকতে আমরা এমন এক অভয়ারণ্যের বাসিন্দা হয়ে উঠি যে মাঝে মাঝে এটাও ভুলে যাই, আমাদের চিন্তাজগতের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। বস্তুত, পৃথিবীটা আসলে আমার চিন্তাজগতের বাইরেই আছে।

'যৌনতা'! ছিছিছি! শব্দটার উচ্চারণই কেমন যেন বিবমিষার জন্ম দেয়। আমাদের শিশুমন যদি আজন্মকাল এটাই জেনে নিশ্চিত থাকতে পারত যে আমাদের কখনো জন্ম' হয় নি, আমরা নেহাতই খসে পড়েছি গাছ থেকে বা আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে রাস্তার ধারে, জোছনা রাতে উঠোনে কোনো এক ফেরেস্তা দিয়ে গেছে অথবা আমরা শুধুই সৃষ্টিকর্তার দান, তা হলে বড়ো ভালো হতো। সমাজের দুর্ভাগ্য, তা তো হয় না। নীতিকথা ও ঔচিত্যের বেড়াজালে 'মন'টিকে শিশু-ভোলানাথ করে রাখলেও, হতচ্ছাড়া, বেয়াড়া শরীরটা সবার অলক্ষে কোথা থেকে এসে বিদ্রোহ জানিয়ে যায়। এবারে কী হবে? এতকাল সমাজ আমাকে যে কথা জানা থেকে আটকে রেখেছিল, শরীর নামক এক সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার এসে আচমকা সেই ডিফেন্স ভেঙে গোল করে গেল। কিন্তু কেন এই নিষেধাজ্ঞা? কেন এই রাখঢাক? কেনই-বা বাস্তব জানতে ও মানতে না দেওয়ার এত প্রচেষ্টা? আর এই প্রচেষ্টার মোক্ষম অস্ত্র— কখনো ধর্ম, কখনো সংস্কৃতি, কখনো ঐতিহ্য, কখনো-বা পরিবার।

টিভিতে কনডম-এর বিজ্ঞাপন দিলে চ্যানেল ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কোনো লেখায় যৌনতার কথা থাকলেই বই লুকিয়ে রাখা হবে। 'সমকাম' শব্দটা উচ্চারিত হলেই মুখ পারলে সাবান দিয়ে ধোয়া হবে। 'আমার পছন্দ' কথাটা একবার প্রকাশ্যে এলেই সবাই মিলে রে রে করে তেড়ে আসবে... তোমার আবার 'পছন্দ' কীসের হে? পছন্দ তো আমরা ঠিক করে দেব। আমরা যাকে 'ভালো পছন্দ' মনে করছি, সেটাই তো শেষ কথা, তার বাইরে তো কিছু নেই— তা সে সায়েন্স পড়াই হোক, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই হোক বা বিয়ে করাই হোক। কিন্তু 'চয়েস' যে বেয়াদব, বেপরোয়া, তাকেও কিছুতে আটকে রাখা যায় না। সমাজ ও পরিবার বলে দেয় রাতে বাড়ির বাইরে থাকা যাবে না, কিন্তু নচ্ছার চয়েস শিখিয়ে দেবে যে, রাতে বাড়ির বাইরে থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আসলে যে 'ঘটনা' ঘটা থেকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই 'ঘটনা' দুপুর দুটোতেও ঘটানো যায়। অতএব দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। তবে দ্বন্দ্ব বা মতের অমিল কোনো খারাপ ব্যাপার নয়। বরং ভিন্নমতের মানুষের মধ্যকার সহাবস্থান পরস্পরকে পরিশীলিত রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়, যখন

আমার 'মত'টিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও একমাত্র মত হয়ে ওঠে, আর যেকোনোরকম ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বাকি মত বা সম্ভাবনার গলা টিপে হত্যা করা হয়।

মানুষের মধ্যে এত অসহিষ্ণুতা কেন? আমার নিজস্ব মত ও পছন্দের যদি টিকে যাবার অধিকার থাকে তা হলে আর একজনেরও থাকুক না, তা সে যতই আমার অপছন্দের হোক। কে কী ধরনের মাংস খাবে খাক তাতে আমার অসুবিধা কোথায়? আমার ইচ্ছে না হলে আমি খাব না। কে কোন শিল্পীর গান শুনতে চাইবে তাতে আমি বাধা দেবো কেন? আমাকে তো সে গান শুনতে বাধ্য করা হচ্ছে না। যুবক-যুবতী ভ্যালেনটাইন্স ডে পালন করলে কেন আমি নিষেধাজ্ঞা জারি করব? আমাকে তো কেউ রঙিন বেলুন আর কার্ড নিয়ে প্রেম নিবেদনের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে বলছে না। কেউ যদি নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পরে রাস্তায় নামে, কেন আমার নৈতিক জগতে হাহাকার পড়ে যায়! কেউ তো আমায় সে পোশাক পরতে বলছে না। তা হলে আমার তথাকথিত রুচি, পছন্দ বা মূল্যবোধের বাইরে কোনো কিছু ঘটলে আমি কেন এত উত্তেজিত হয়ে উঠছি, আর চরম আক্রোশে তার বিরোধিতা করার চেষ্টা করছি? কেউ তো আমায় বলে নি আমার অপছন্দের জিনিস গ্রহণ করতে বা কেউ জোরও করে নি। কিন্তু আমি সর্বতোভাবে তৎপর হয়ে উঠছি আমার অপছন্দের জগতের অস্তিত্বকে একদম শিকড় থেকে উপড়ে ফেলার জন্য। আমার হাতিয়ার কখনো ধর্ম, কখনো সংস্কৃতি, কখনো ঐতিহ্য। আর অন্য কিছু না থাকলে, অবশ্যই পরিবার।

এই প্রসঙ্গে, মনে পড়ছে কলেজে আমার এক সহপাঠিনীর কথা। খুব ছোট থেকে পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক গুরুজনের দ্বারা দিনের পর দিন নৃশংসভাবে নির্যাতিত হওয়ার পর সে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে তার মাকে বলেছিল সে কথা। অসহায় মা বলেছিলেন 'চুপ। চুপ। আর কাউকে বলিস না। এ কথা প্রকাশ হলে অপমান ও লজ্জার একশেষ হবে।' আমার ধারণা এটা খুবই একটা চেনা অভিজ্ঞতা, আমি কোনো নতুন কথা বলছি না। তারপরও মুখ খুলতে হবে, মুখ খোলা দরকার। অনেকদিন তো হলো আরামে কান খুঁচিয়ে কালচারের চাদর মুড়ি দিয়ে ঔচিত্যের পাশবালিশ জড়িয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে কাটানোর। এবার চোখ মেলে দেখার সময় হয়েছে। অবহেলায় অবজ্ঞায় 'রাংতায় মোড়া যুগের অসুখ' কীভাবে সমাজব্যবস্থার শিরা-ধমনিতে ঢুকে পড়ে মহাপচনের গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়েছে, তা যদি আমরা এখনো না বুঝি তাহলে ভবিষ্যতে এজন্য অনেক মূল্য দিতে হতে পারে।

বেদনার জলছাপ

মেয়েদের ওপরে যে হিংস্র ঘটনা ঘটে, পথেঘাটে, বাড়িতেও, সেটা মেয়েদের নিজস্ব ব্যাপার বলেই জানে সবাই। পুলিশ, কোর্ট, প্রসিকিউটর সকলে। যাদের ব্যাপার, তারাই সামলাক। হয় ঘরে বসে থাকুক, নয় বাইরে বেরিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করুক। যে ব্যাপারটাকে পুলিশ আর আদালত মনে করে মেয়েদের সমস্যা, তাতে কারও কোনো শাস্তি শেষ পর্যন্ত হয় না। গড়পড়তা অপরাধীরাও সেটা জানে।

এত আন্দোলন, এত এত কথা, লেখা— আচ্ছা, তার ফল কী হলো? এত দিনে কী পেল নারীরা? আমরা দেখছি যে, শিক্ষা, সাহস, বুদ্ধি, কারিগরি জ্ঞান কোনো কিছু দিয়েই এই হিংস্রতা ঠেকানো যাচ্ছে না। অথচ যাঁরা বয়সে বড়ো, নারীমুক্তি আন্দোলন করেছেন, মেয়েদের জন্য সাংবিধানিক সংগঠন দাবি করেছেন, মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য আইনের সংশোধন নিশ্চিত করতে পেরেছেন, তাঁদেরও দেখি হতাশ হতে। জানা যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের অর্থ ও লোকবলের অভাব, দক্ষ মানুষের অভাব। নারীর প্রতি

সহিংসতার বিরুদ্ধে অভিযোগ না নেওয়া, ভুলভাবে অভিযোগ দায়ের করা, দুর্ব্যবহার, অশালীন মন্তব্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে গাফিলতি, ডাক্তারি পরীক্ষা সময়মতো না করানো, এরপর যদি চার্জশিট হয়ও থাকে পাবলিক প্রসিকিউটরের ঔদাসীন্য। তদুপরি থাকে তদন্তকারী অফিসারের বদলি। বিচার পাওয়ার রাস্তা যেন আক্রান্ত মেয়েদের জন্য এক হার্ডল রেস। থানায় আজো একা একটা মেয়ে যেতে পারে অভিযোগ দায়ের করতে? যদি যায়ও নিজের পোশাক, চরিত্র, অতীত নিয়ে কোনো মন্তব্য না শুনে ফিরতে পারে? এমনকি অভিযোগ না নিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলতে পারে পুলিশ। কারণ, নারীর প্রতি সহিংসতা তো শেষ পর্যন্ত মেয়েদেরই নিজস্ব ব্যাপারস্যাপার!

আজ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে : নিপীড়ন-নির্যাতন মুখ বুজে আর সইব না। আমরা লড়ব। থানা যদি অভিযোগ না নেয়, মহল্লা আর গ্রামের লোক এনে ঘিরে ফেলব থানা। আইনজীবী, হাসপাতাল, সমাজ সংগঠনের লোকের নাম থাকবে ব্যাগে থাকা নোটবইয়ে। যে রাজনৈতিক দল অভিযুক্তদের পক্ষ নেবে, তাদের বয়কট করব। ত্যাগ করব তাদের, যারা নারীর প্রতি হিংস্রতাকে আচরণে, ভাষায়, লেখায় সমর্থন করে। সন্তান, ভাই, বাবা, বন্ধুকে শামিল করব হিংস্রতামুক্ত জীবনের জন্য পরিচালিত অধিকার আন্দোলনে। স্টকার, উত্ত্যক্তকারী, শ্লীলতাহানি করা মাস্তান, ধর্ষকদের নাম ও ছবি টাঙাব দেওয়ালে। কেবল নৃশংস, ভয়ানক ঘটনা, যা মৃত্যু ঘটায়, তা-ই নয়, সারা দেশে, গ্রামেগঞ্জে, যেখানে নারী আক্রান্ত, তাদের পাশেই দাঁড়াব। আর হ্যাঁ, দুটো শব্দ এবার আমাদের ব্যবহার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সময় এসেছে : ১. অত্যাচারের আগে 'পাশবিক' বিশেষণের ব্যবহার, কারণ পশুরা আপত্তি করছে। আর মেয়ের আগে 'ধর্ষিতা', 'নিপীড়িতা', 'লাঞ্ছিতা', কারণ আমাদের বল ও শক্তি আক্রমণ-উত্তীর্ণ!

অমিতা দাস সংস্কৃতিকর্মী। bobyamita@gmail.com